গল্প

টিচার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

টিচার

রাজমাতা হাইস্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার ভেবেচিন্তে শেষপর্যন্ত টিচারদের কিছু সদুপদেশ দেওয়া স্থির করল। বুড়ো বয়সে এমনিতেই তার ঘুম হয়। কম, তার ওপর এইসব যাচ্ছেতাই খাপছাড়া ব্যাপারে মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় কদিন আর ঘুম হয়নি। টিচাররা ধর্মঘট করবে বেতন কম বলে, বেতন বাকি থাকে বলে, এটা সেটা হরেকরকম অসুবিধা আছে বলে চাকরি করতে। বাপের জন্মে রায়বাহাদুর এমন কথা শোনেনি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কি মজুর না ধাঙড় যে ধর্মঘট করবে?

শুধু তার স্কুলে এসব গোলমালের সম্ভাবনা ঘটলে সে অবশ্য ব্যাপারটা গ্রাহ্য করত না। দুটো ধমক দিয়ে একটা মিষ্টি কথা বলে, সকলকে খেপাচ্ছে কোন মাথাপাগলা ইয়ং টিচারটি সন্ধান নিয়ে তাকে একচোট মজা দেখিয়ে সব ঠিক করে দিত অনায়াসে। কিন্তু সারা বাংলাদেশের সব স্কুলটিচাররা জোট বেঁধেছে, সম্মেলন করছে। খেতে পায় না ব্যাজ পরছে। করুক, পরুক। যা খুশি করুক অন্য স্কুলের টিচাররা, তার স্কুলে সে ওসব বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে দেবে না, ওসব হীনতা স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচারিতা ঢুকতে পারবে না তার পবিত্র শিক্ষায়তনে।

স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করে, বিদ্যালয়ের মহান আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড তাদের গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালন যাদের জীবনের ব্রত, বুনো রামনাথ যাদের গর্ব ও গৌরব; তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তারা নিজেদের নামিয়ে আনবে, আদর্শ চুলোয় দেবে, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অসভ্য মজুর ধাঙড়ের মতো হাঙ্গামা করবে, তা কখনো হতে পারে না, রায়বাহাদুর তা বিশ্বাস করে না। মোটামুটি এই ধরনের সদুপদেশ রায়বাহাদুর শোনাল শনিবার স্কুল ছুটি হবার পর। অবশ্য অনেক ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে, দমক-গমক-মূর্ছনা আমদানি করে, গুরু-গম্ভীর চালে।

আপনারা কী বলেন?

কে কী বলবে? সকলে চুপ করে থাকে। রায়বাহাদুরের ধৈর্য বড় কম, বিশেষত এখন এত লম্বা বক্তৃতা দেবার পর এই গরম একফোঁটাও আছে কি না সন্দেহ, কেউ কিছু বলতে গেলে হয়তো গালাগালি দিয়ে বসবেন, গালে চড় বসিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয়। কিছু বলার দরকারও ছিল না। টিচারদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে এটা অফিসিয়াল মিটিং নয়, রায়বাহাদুরের নিজস্ব সদুপদেশ দানের সভা। চুপচাপ বসে শোনাই এখানে যথেষ্ট।

প্রৌঢ় হেডমাস্টার শশাঙ্ক কেবল একবার মাথা চুলকিয়ে বলে, আজ্ঞে তা বৈকি। শিক্ষক জীবনের মহান আদর্শের কথা কি তারা ভুলতে পারে।

সভার শেষে শশাঙ্ক একান্তে আবার বলে, গত মাসের বাকি মাইনেটার জন্য একটু, যে রকম দিনকাল, সংসার চালানোই-

কে উসকানি দিচ্ছে জানেন?

ক-বছর আগে হলে শশাঙ্ক হয়তো দু-একটা কথা উচ্চারণ করে ফেলত। কিন্তু শশাঙ্কবাবুও আর সে শশাঙ্কবাবু নেই, অনেক বদলে গেছে।

আজ্ঞে, উসকানি কে দেবে। একজন দুজনের উসকানির ব্যাপার নয়, আপনি তো জানেন, দেশজুড়ে এ রকম চলছে।

স্কুলের বাগানের দিকে চেয়ে থেকে রায়বাহাদুর বলে, গিরীন খুব পলিটিক্স করে বেড়ায় নাকি?

বুকটা ধড়াস করে ওঠে শশাঙ্কর, গিরীন তার জামাই। মনে মনে আরেকবার গিরীনকে অভিশাপ দিয়ে বলে, পলিটিক্স করে না। মিটিং-ফিটিং হলে হয়তো কখনো শুনতে যায়। আর স্কুলে পলিটিক্স নিয়ে কিছুই হয় না।

হয় না? সেদিন স্ট্রাইক করে ছেলেরা স্কুলের মাঠে যে মিটিং করল?

আজ্ঞে সেটা ঠিক পলিটিক্যাল মিটিং নয়। প্রোটেস্ট মিটিং মাত্র। কলকাতায় স্টুডেন্টদের ওপর গুলি চালানো হল, তারই প্রোটেস্ট–

কলার কাঁদিটা বাড়তি হয়েছে না? এবার কেটে ঝুলিয়ে রাখলে পেকে যাবে দু-এক দিনের মধ্যে, কী বলেন?

কাল মালিকে বলব। রাতারাতি যেন চুরি হয়ে যায় না, দেখবেন।

রায়বাহাদুর হাসল।

সন্ধ্যার পর গিরীন বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে রায়বাহাদুর আশ্চর্য হল না। গিরীনের সম্পর্কে তার প্রশ্নে ভড়কে গিয়ে শশাঙ্ক নিশ্চয় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দোষ কাটাতে, কথায় কথায় তাকে জানিয়ে দিয়ে যেতে যে ভুলচুক যদি সে করেই থাকে তিনি যেন ক্ষমা করে নেন, এবার থেকে সে সাবধান হবে। তাই যদি হয় তবে ভালোই।

গিরীন কিন্তু ওসব কথার ধার দিয়েও যায় না। খুব বিনীত ও নম্রভাবে পরদিন তার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন জানায়। রায়বাহাদুর অবশ্য বুঝতে পারে তার মানেও তাই। খানিকটা স্পষ্টভাবে জানানোর বদলে ইঙ্গিতে জানানো যে সে অনুগতই, রায়বাহাদুর যা অপছন্দ করেন তা থেকে সে তফাত থাকবে, তাকে চটাবে না।

অন্নপ্রাশন? ছোট ছেলের? তা বেশ, কিন্তু আমি নেমন্তন্নে যাই না, বুড়ো শরীরে সয় না ওসব। রায়বাহাদুর অমায়িকভাবে হাসে।

আপনাকে পায়ের ধুলো দিতেই হবে। গিরীন বলে নাছোড়বান্দার জোরালো অনুনয়ের সুরে, সকাল সকাল গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবেন শুধু, একটু ফলমূল মুখে দেবেন। সবাই আশা করছি, মনে বড় আঘাত পাব না গেলে।

রায়বাহাদুর যেতে রাজি হয়েছে ধরে নিয়েই যেন একটু ইতস্তত করে গিরীন। আবার বলে, একটা কথা বলি আপনাকে, দোষ নেবেন না। খেলনা বা উপহার কিছু নিয়ে আসবেন না খোকার জন্য। আমাদের বংশের রীতি আছে, কোনো কাজে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া কারো কাছে সামান্য উপহারও নেওয়া চলবে না। ঠাকুরদা বা তাঁর বাবা অভিশাপ দিয়ে গিয়েছেন, একগাছি তৃণ নিলে নাকি বংশের সর্বনাশ হবে।

বল কী হে?

একটা দুশ্চিন্তা কেটে যায়, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে গেলে কিছু দিতে হবে এ চিন্তাটা ছিল রায়বাহাদুরের। এবারে একটু ভেবে গিরীনের একান্ত আগ্রহ দেখে, রাজি হয়ে বলল, এত করে যখন বলছ–

সে কিছু খাবে না, কিন্তু এই সুযোগে মিষ্টি প্রভৃতি তার সঙ্গে কি দেবে না গিরীন? রায়বাহাদুর ভাবে। অনেকেই দেয়।

প্রায় দশটায় রায়বাহাদুর গিরীনের বাড়ি পৌঁছল। বাড়ি দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন উৎসবের চিহ্ন না দেখে আরো বেশি। এত ছোট, এত পুরনো, এমন দীনহীন চেহারায় একতলা পাকা বাড়ি হয়, রায়বাহাদুর জানত না। কারণ, এর চেয়েও খারাপ বাড়ি চারিদিকে অসংখ্য ছড়ানো থাকলেও সে কোনোটার দিকে কখনো তাকিয়ে দেখেনি–এ ধরনের বাড়ির অধিবাসী কস্মিনকালেও তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পায়নি। ছেলের অন্নপ্রাশন রীতিমতো একটা উৎসবের ব্যাপার। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে ব্যান্ড বেজেছিল। মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে সে অন্তত সানাই বাজায়। লোকে গিজগিজ করে তার বাড়িতে, ছেলের বেলা বেশি হোক, মেয়ের ছেলের বেলা কম হোক, গিজগিজ করে। গিরীনের বাড়িতে লোক আছে বলেই মনে হয় না। ভেতর থেকে শুধু ভেসে আসে ছোট একটা ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্না।

গাড়ির আওয়াজে বেরিয়ে এসে গিরীন তাকে অভ্যর্থনা জানায়, যথাসাধ্য আয়োজন করেছি, দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন।

যথাসাধ্য আয়োজন? বৈঠকখানার ভাঙা তক্তপোশে-বিছানো-ছেঁড়া ময়লা শতরঞ্চির এক প্রান্তে কুণ্ডলী-পাকানো ঘেয়ো কুকুরের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে খালি-গায়ে জবুথবু একটা মানুষ, মেঝেতে লোম-ওঠা বিড়ালটা ছাড়া আর কোনো জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে। তক্তপোশ ছাড়া বসবার আসন আছে আর একটি, কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের সামনে কালিমাখা একটি কাঠের চেয়ার। দিনে বৈঠকখানা হলেও ঘরটি যে রাত্রে শোবার ঘরে পরিণত হয়। তার প্রমাণ, গুটানো কাঁথা-মশারির বান্ডিলটা জানালায় তোলা রয়েছে, তক্তপোশের নিচে ঢুকিয়ে আড়াল করে গোপন করে ফেলবার বুদ্ধিটা বোধ হয় কারো মাথায় আসেনি।

ইনি আমার বাবা, গিরীন পরিচয় করিয়ে দেয়, দুবছর ভুগছেন। আর বছর ডাক্তার বলেছিলেন, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে, পেরে উঠিনি, সাত-আটশ টাকার ব্যাপার।

জবুথবু বৃদ্ধ কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। দুটি হাত একত্র করে নমস্কার জানাবার মতোই যেন চেষ্টা করে মনে হয়। ক্ষীণকণ্ঠে কী বলে ভালো বোঝা যায় না।

আসুন। ভেতরে চলুন।

রায়বাহাদুরকে গিরীন বাড়ির মধ্যে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। উঠান পেরিয়ে যাবার সময় এদিক-ওদিক তাকায়, তাকিয়ে রায়বাহাদুর যথাসাধ্য আয়োজনের কোনো চিহ্নই দেখতে পায় না। রোয়াকে একজন অল্প একটু হলুদ বাটছে, তার বাড়িতে দৈনিক রান্নার জন্য যতটা হলুদ বাটা হয় তার সিকিও হবে না। যে বাটছে তার বেশটা তার বাড়ির ঝিয়ের মতোই, তবে রায়বাহাদুর অনুমান করতে পারে মেয়েটি ঝি নয়, বাড়িরই কোনো বৌ-ঝি। ওপাশে রান্নাঘরে খুন্তি দিয়ে কড়ায় ব্যান্নন নাড়ায় রত বৌটির শাখা-পরা হাতটি শুধু চোখের এক পলকে দেখেই কী করে যেন রায়বাহাদুর টের পেয়ে যায় যে সে গিরীনের বৌ।

চার ভিটেয় চারখানা ঘর তোলার সুযোগ থাকলেও, বৈঠকখানাটি বাদ দিলে ভেতরে ঘর মোটে দুখানা-রান্নাঘরের চালটি ছাড়া। গিরীনের শোবার ঘরখানার নমুনা দেখেই রায়বাহাদুর বুঝতে পারে অন্য ঘরখানা কেমন, নড়াচড়ার স্থান কতটা, কী রকম আলোবাতাস আসে।

জলচৌকিতে পাতা পুরনো কার্পেটের আসনে বসে রায়বাহাদুরের দম আটকে আসে। ছোট ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্নাটা এখন খুব কাছে মনে হয়।

কে কাঁদে?

ছেলেটা কাঁদছে, ছোট ছেলেটা। যার মুখে ভাত, জ্বর আসছে বোধ হয়, জ্বর আসবার সময় এমনি করে কাঁদে। জ্বর এসে গেলে চুপ করে যাবে।

রায়বাহাদুর অস্বস্তি বোধ করে, এদিক-ওদিক তাকায়, একটা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে মনে হয় তার। গিরীন নীরবে তাকে লক্ষ্য করে, ফাঁদে-পড়া হিংস্র জন্তুর দিকে শিকারি ব্যাধের মতো শান্ত নির্বিকারভাবে। মুখ তার থমথম করে মনের আপসহীন মনোভাবে।

আপনি তো ভালো হোমিওপ্যাথি জানেন। সবাই বলে যে ডাক্তারি পাস করেননি বটে, কিন্তু আপনার ওষুধ একেবারে অব্যর্থ। সে বলে ব্যঙ্গ ও তোষামোদের সুরে। ছেলেটাকে দেখে দিন না একটু ওষুধ? বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে ছেলেটা।

রায়বাহাদুর যেন রাজি হয়েছে তার ছেলেকে দেখে ওষুধ দিতে এমনিভাবে দরজার কাছে গিয়ে গিরীন ডাকে, শুনছ? খোকাকে নিয়ে এসো শিগগির। আহ্, এসো না নিয়ে! দেরি করছ কেন?

নিজের অতিরিক্ত ধৈর্যের কৈফিয়ত দেবার জন্যই যেন রায়বাহাদুরের কাছে গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর পারি না এদের সঙ্গে। আপনার সামনে আসবে যা পরে আছে

তাই পরে, তাতেও লজ্জা। সম্বল তো সেই বিয়ের একখানা শাড়ি, এক ঘণ্টা লাগবে এখন সেখানা বার করে পরতে। আর পারি না সত্যি।

সে এসে কৈফিয়তের বিরক্তি জানানো শুরু করতে-না-করতেই ছোট একটি কঙ্কাল বুকের কাছে ধরে পাশুটে রঙের রোগা একটি বৌ দরজা দিয়ে ঢুকছিল। একনজর তাকিয়েই রায়বাহাদুর টের পায় পরনের কাপড় বদলে বিয়ের সময়কার একমাত্র শাড়িটি সে পরে আসেনি। এটাও সে টের পায় যে ওকে আসতে দেখেই গিরীন তার কাছে এসে শোনাচ্ছে তার বৌয়ের মানুষের সামনে বার হবার উপযুক্ত কাপড়ের অভাবের কথা। তার প্রায় পিছুপিছুই বৌটি ঘরে ঢুকেছে। মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রায়বাহাদুরের। তার ভয় করে।

ও তুমি এসেছ, গিরীন বলে নির্বিকারভাবে, এইখানে শুইয়ে দাও।

রায়বাহাদুরের উলের মোজা আর পালিশ-করা দামি চকচকে জুতো-পরা পায়ের কাছে মেঝেটা সে দেখিয়ে দেয়। বৌ তার ইতস্তত করে, বড় বড় জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় তার মুখের দিকে। এত শীর্ণ বৌটি, এমন শুকনো বিবর্ণ তার রক্তশূন্য মুখ, কিন্তু তার রূপ দেখে ভেতরে ভেতরে মুচড়ে যায় রায়বাহাদুর। তার বাড়ির মেয়েরা, ফুলি ঝিটা পর্যন্ত যেন শুধু মেদ আর মাংস। গিন্নির কথা ধর্তব্যই নয়। তিনি প্রায় গোলাকার। তাঁর মেজ মেয়ে আর মেজ ছেলের বৌ রোগা ছিপছিপে, বড় ছেলের বৌটাও ছিপছিপে ছিল বিয়ের সময়, আজকাল মুটোচ্ছে। গিরীনের ক্ষীণাঙ্গী বৌটির সাথে মিলিয়ে রায়বাহাদুর বুঝতে পারে। তার মেয়ে-বৌদের গড়নটাই শুধু ছিপছিপে, অতি বেশি মেদ-মাংসেই তারা গড়া, প্রত্যেকে তারা তার গিন্নিরই সূচনা। সত্যিকারের রোগা, ক্যাংটা তরুণীকে চেয়ে চেয়ে দেখতে এত ভালো লাগে–রায়বাহাদুরের এত তীব্র ইচ্ছা করে টিপেটুপে ছেনেছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে।

কী করছ? গিরীন বলে বৌকে অনুযোগ দিয়ে, ওখানে শুইয়ে দাও। উনি পায়ের ধুলো ছোঁয়াবেন, আশীর্বাদ করবেন। ওষুধ দেবেন।

না! মা! রায়বাহাদুর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, আমি ওকে ওষুধ দিতে পারব না। ওর ভালো চিকিৎসা দরকার। ওকে তুমি ডাক্তার দেখাও, ভালো ডাক্তার দেখাও।

বিনা ফী-তে কোন ডাক্তার দেখবে বলুন? গিরীন যেন আমোদ পেয়ে মুচকে মুচকে হাসে।

ভয় করে রায়বাহাদুরের। মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে ওঠে। কতক্ষণ খেলা করবে গিরীন তার সঙ্গে কে জানে, তারপর এই বর্বর নিষ্ঠুর খেলার শেষে কী করবে তাই-বা কে জানে। এরা বিপ্লবী, এরা খুনে, এরা সব পারে। শশাঙ্কর জামাই বলে, তার স্কুলের একজন টিচার বলে বিশ্বাস করে একা একা এই ছদ্মবেশী খুনের খপ্পরে এসে পড়ে কী বোকামিটাই সে করেছে।

সব অবস্থাতে যেভাবেই হোক নিজেকে বাঁচানোর কৌশল খুঁজে বার করে কাজে লাগানোর চেষ্টা রায়বাহাদুরের মজ্জাগত। রায়বাহাদুর মাথা হেঁট করে থাকে কয়েক। মুহূর্ত, সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করে। হাতের তালুতে মুছে নেয় নিজের কপাল। তারপর। মুখ তুলে বলে, মা, খোকাকে শুইয়ে দাওগে। কিছু তুমি ভেবো না মা। বৌমাই বলি তোমাকে, গিরীন আমার ছেলের মতো। তোমার কোনো ভাবনা নেই বৌমা, ছেলে তোমার ভালো হয়ে যাবে, আমি তোমার ছেলের চিকিৎসার ভার নিলাম। আমি এক্ষুনি গিয়ে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি–

এখুনি যাবেন? তা হবে না, ফলটল একটু মুখে না দিয়ে গেলে বড় কষ্ট হবে আমাদের মনে। অকল্যাণ হবে আমাদের। আপনার মতো মানুষ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন–

গিরীনের বিনয়ে বুকটা ধড়াস ধড়াস করে রায়বাহাদুরের। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পায়ের চকচকে জুতোর দিকে। অতি কষ্টে বলে, বেলা মন্দ হয়নি। নিমন্ত্রিতেরা আর কেউ?

আজ্ঞে বলিনি আর কাউকে। ইচ্ছে ছিল বলবার, ভেবেছিলাম ওনার হাতের দুগাছা চুরি আছে তার একটা বেচে দিয়ে কয়েকজনকে বলব, স্কুলমাস্টারের স্ত্রীর হাতে শাঁখা থাকলেই

ঢের। তারপর ভাবলাম ছেলের মুখে-ভাতে শেষ সম্বলটুকু খোয়াব, তার চেয়ে বরং সম্বলটা থাক, ও মাসেও পুরো মাইনে না পেলে উপোসটা ঠেকানো যাবে।

বুড়ো হলেও বুদ্ধির ধার একেবারে পড়ে যায়নি রায়বাহাদুরের। জীবনে উঠতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়েছে অনেকবার, নিজের বুদ্ধি খাঁটিয়েই নিজের মুশকিল আসান করেছে। আজকের বিপদের ধরনটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এটাই হয়েছে ফ্যাসাদ। উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছে না গিরীনের। নিজের দুর্দশা চোখে দেখিয়ে তার দয়া জাগাবার সাধ থাকলে চোখে এভাবে আঙুলের খোঁচা দিয়ে কি কেউ তা দেখায়, পাগল ছাড়া? তাকে বিরক্ত করে, চটিয়ে এমন টিটকারি দেওয়ার ভঙ্গিতে দেখায়, এমন উদ্ধত বিনয়ের সঙ্গে কাল টিচারদের সভায় কিছু না বলে গিরীন যেন ঘাড় ধরে তাকে বাড়ি টেনে এনে বাস্তব প্রতিবাদ জানাচ্ছে তার বক্তৃতার, ব্যঙ্গ করছে তাকে। কিন্তু কেন করছে সেটা তো কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রায়বাহাদুরের। তার স্কুলের একজন টিচার কি এত বড় গাধা যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না। এভাবে তার কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহ আদায় করা যায় না। এতে বরং তারই বিপদ, সমূহ বিপদ?

মুখের ভাব গলার সুরে সহানুভূতি আনার চেষ্টা করে রায়বাহাদুর বলে, তোমার অবস্থা এত খারাপ তা তো জানতাম না গিরীন। অ্যাপ্লিকেশন দিও, ও মাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। তুমি ভালো পড়াও শুনেছি। আর বাকি মাইনেটাও বরং পাইয়ে দেব তোমায় সোমবার।

গিরীন ভয় পেয়ে হাতজোড় করে বলে, তা করবেন না স্যার। লোকে বলবে ছেলের মুখে-ভাতের ছলে আপনাকে বাড়িতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, বাকি মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্বনাশ করবেন না স্যার।

চোখের পলক আটকে যায় রায়বাহাদুরের, ঢোক গিলতে গিয়ে দেখে সেটাও আটকে গেছে। ঘরে যে অসীম দৈন্য ভিখারির সকরুণ আবেদনের মতো এতক্ষণ। তাকে পীড়ন করছিল হঠাৎ যেন সেটা দাবিদারের শাসানির মতো ফুঁসে উঠেছে। উঠানে তিনটি উলঙ্গ

ছেলেমেয়ে খেলা করছে ধুলামাটি নিয়ে, খেলা যেন ছল ওদের, রায়বাহাদুরকে ওরা অবজ্ঞা জানাচ্ছে। ও-ঘরে জ্বরো ছেলেটার কান্না ঝিমিয়ে এসেছে–কিন্তু সেও যেন ভয় দেখাল রায়বাহাদুরকে, কান্না নিস্তেজ হয়ে আসা যেন ঘোষণা বাচ্চাটার যে কান্না সে চিরতরে থামিয়ে দেবে, সে মরবে, মরে দায়ী করে রেখে যাবে তাকে।

তাকে আরো শাসানো দরকার বলেই যেন গিরীনের পরিবারের আরো দুজনে এবার আসরে নামে। প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোক তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে একটি কুমারী মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসে।

দ্যাখ গিরীন, দ্যাখ, ধেড়ে মেয়ের কাণ্ড দ্যাখ। ডাল ধুতে দিয়েছি, লুকিয়ে কাঁচা ডাল চিবোচ্ছে!

গিরীনের মা থেমে যান, জিভ কাটেন। মেয়েটি পালিয়ে যায় হাত ছিনিয়ে নিয়ে। এক মুহূর্ত হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে মা-ও সরে যান।

আমি এবার উঠি গিরীন।

একটু বসুন।

গিরীন বেরিয়ে যায়। গিরীন ফিরে আসবার একটু পরে সেই চুপি চুপি ডাল-খাওয়া মেয়েটি একটি রেকাবিতে দুটি সন্দেশ, একটি কলা, কয়েক টুকরো আপেল ও শশা নিয়ে জড়সড় হয়ে ঘরে আসে। বাঙালি গেরস্থঘরের হিসেবে বিয়ের বয়স তার পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। মেয়েটি রোগা, পুষ্টির অভাবে সত্যিকারের রোগা। সত্যিকারের রোগা মেয়ের দিকে তাকাবার মোহ কিন্তু তখনকার মতো কেটে গিয়েছিল। রায়বাহাদুরের, নীরবে সে দু-এক টুকরো ফল মুখে দিতে থাকে।

বৈঠকখানা দিয়ে যাবার সময় চৌকির প্রান্তের জরাজীর্ণ মানুষটি কষ্টে চোখ মেলে। তাকায়, রায়বাহাদুর একনজর দেখেই তাড়াতাড়ি চলে যায় বাইরে।

সোমবার গিরীন নোটিশ পায়, বরখাস্তের নোটিশ। সে প্রত্যাশা করছিল। ক্ষমতা থাকলে ফাঁসির হুকুম দিত রায়বাহাদুর। কিন্তু একটা কথা জানে গিরীন। রায়বাহাদুর ভুলতে পারে না, তার ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলো, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা, দয়া-মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।